অভ্যুত্থানের চিন্তাশিখা

মুসা আল হাফিজ

ঐতিহ্য

উৎসর্গ

শহিদ আবরার ফাহাদ

সূচি

আন্দোলনটি কোটা ইস্যুর চেয়েও গভীর ৯
ইসলামি তত্ত্বে রাজনৈতিক আজাদি : লড়ো উপসংহারের জন্য ১৫
রাষ্ট্র সংস্কারের সূত্র প্রস্তাব ২২
বিপ্লবের তত্ত্ব, উপসংহারের দায় ২৭
বাঙালি মুসলিম : শরৎ-বঙ্কিমের ঘৃণাভাষ্য ও লাল জুলাইয়ের চটকনা ৩৩
বাঙালি ও মুসলমান : একাত্মতার রুহানিয়াত ও ইনকিলাব ৪০
ট্রুথ অ্যান্ড রিকনসিলিয়েশনের কথা বলছি ৮৩
সংবিধান : জনগণের ক্ষমতা না সোনার পাথর বাটি ৮৮
জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের দাবিতে সংবিধান সংস্কার ৯২
আমাদের সত্তার সত্য ও শিক্ষাদর্শন ১০২
বাংলাদেশে পরিবেশ সংকট ও যুব নেতৃত্ব ১০৯
ইসলামি আন্দোলন : জরুরি কথাসূত্র ১১৪

আন্দোলনটি কোটা ইস্যুর চেয়েও গভীর

এবারের কোটা সংস্কার আন্দোলন। ধীরগতিতে শান্তিপূর্ণ শুরু। আন্দোলনের সামনে তাজা তরুণেরা। তারা কোটা সংস্কার চান। কারণ, বিদ্যমান কোটা ব্যবস্থা বৈষম্যমূলক। সরকার বলছে, কোটা সংস্কার চায় তারাও। ফলে আলোচনা ছিল চাওয়াসমূহের সমন্বয় ও সমাধানের পথ। কিন্তু ঘটল উল্টোটি। আমরা দেখলাম রক্ত, হত্যা; ছয়টি তাজা প্রাণের মৃত্যু। আজ ঢাকাসহ বিভিন্ন জেলায় বহুসংখ্যক মৃত্যুর ভয়াবহ খবর আসছে একের পর এক। আন্দোলন ধারণ করেছে তীব্র রূপ। সারা দেশের তারুণ্য মরণের বিরুদ্ধে উচ্চারণ করছে 'জীবন, জিন্দাবাদ।'

কোটা সংস্কার ইস্যুতে দুটি বড় ঢেউ আমরা দেখলাম। একটা বয়ে গেছে ২০১৮-তে, আরেকটা বহমান। এই ঢেউগুলো বেরিয়ে এসেছে নতুন প্রজন্মের শিক্ষার্থীদের আবেগ, সাহস ও বুদ্ধিমত্তা থেকে। তারা রাষ্ট্রযন্ত্র ও ক্ষমতাচক্রের সবচেয়ে অসুস্থ চেহারাকে খোলা সড়কে উদোম করে দিয়েছে নিকটতম ব্যবধানে দুইবার। কাজটি কোনোভাবেই সহজ ছিল না। আঠারোতে তারা সড়ক দুর্ঘটনারোধে রাষ্ট্রে মেরামতের জরুরি কাজের সাথে আমাদের পরিচয় ঘটাল নতুন করে। যদিও তারা বিদ্যালয়ে ফিরে যাবার পর আমরা একে এককদমও সামনে নিয়ে যেতে পারিনি।

এবার তারা ক্ষমতার ইগো, একরৈখিক দম্ভ এবং জনগণের জীবনের মূল্যহীনতার বাস্তব চিত্রকে দিগম্বর করল আরেকবার। এর পাশাপাশি যেকোনো অধিকারপ্রয়াসের বিপরীতে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার নাম করে চাপানউতোর খেলার ধারাবাহিকতাকেও বড়সড় ধাক্কা দিল। অধিকার চাওয়া বনাম মুক্তিযুদ্ধের চেতনার যে বাইনারিকে প্রাতিষ্ঠানিক চরিত্র দেওয়া হয়েছে এখানে।

শিক্ষার্থীদের উচ্চারণে এর প্রতি অবজ্ঞা, শ্লেষ, বিদ্রূপ ও প্রত্যাখ্যান মন্দ্রিত হয়েছে। তারা জানে, তাদের পরিচয়কে রাজাকারির সাথে কোনোভাবে

সম্পৃক্ত করার আদৌ কোনো অর্থ নেই, সুযোগ নেই, বাস্তবতা নেই। তারা কোনো রাজাকারির উত্তরাধিকারও বহন করছে না। তারা বহন করছে আরেক স্বাধীনতাকে। বৃহত্তর মুক্তিকে। ১৯৭১ সালের হাতছাড়া স্বাধীনতাকে তারা নিজেদের অধিকারে আনতে চায়। প্রয়োজনে আরেকবার স্বাধীনতা অর্জনের অভিপ্রায়ে তারা জাগ্রত, জ্বলন্ত।

কথাটি খুব ভারী হয়ে গেল। কিন্তু এটাই বাস্তবতা। মুক্তিযুদ্ধকে একটা দল ও পরিবার নিজেদের অপকর্মের ঢাল বানিয়েছে, এর ওপর কায়েম করেছে অপরাধমূলক মনোপলি। এর ওপর ভর করে মানুষকে ভাবছে প্রজা। ফলে এই প্রজন্ম এই সময়ে নাগরিকদের অধিকার, সুযোগের সমতা, রাষ্ট্রের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বের সুরক্ষা এবং রাষ্ট্রের মালিকানা তার প্রকৃত মালিক জনতার কাছে ফিরিয়ে দেবার প্রশ্নে প্রতিবাদী ও লড়াকু। তারাই বাংলাদেশের আত্মাকে বহন করছেন, স্বাধিকার চেতনার প্রকৃত ধারক তারাই। বিপরীতে যারা শক্তি প্রদর্শন করছেন, রাজাকার শব্দটির সাথে তাদের আত্মীয়তা থাকতে পারে। বস্তুত তারা এই সময়ের রাজাকার।

শিক্ষার্থীরা তাজা, প্রত্যয়ী ও কাব্যিক সাহসে নিজেদের ভাষা ও তত্ত্ব বয়ন করেছে। প্রেক্ষাপটের বাস্তবতায় তারা আমাদের ঋণী করেছে বড় অর্থে। তাদের সাহস ও আত্মবিশ্বাস আমাদের পাতাঝরা জীর্ণতার কানে আরেকবার বসন্তের সম্ভাবনার গান ছড়িয়ে দিল।

এখানে একধরনের 'ডেমোক্রেটিক ব্রিকোলেজ' জনতার ভাষাকে বন্দী করে রেখেছে। অসন্তোষ প্রকাশের আওয়াজমাত্রই কণ্ঠরোধের শিকার। আমরা অভ্যস্ত হয়ে গেছি আত্মাবমাননায়। মহামহিম ক্ষমতার নারাজির মানেই নজরদারি, আতঙ্ক, হুলিয়া, গুলি। মহাক্ষমতাধর রাজভাষ্য, রাজপিতা ও রাজপরিবার এখানে দেবতা। পূজা দিতে হবেই। চাহিবামাত্রই তাদের হাতে তুলে দিতে হবে নিজেদের অধিকার দলনের অধিকার। নতুবা ক্রসফায়ার, আয়নাঘর, রাষ্ট্রদ্রোহের ব্লেইম। আর রাজাকার বনে যাওয়া তো একদমই ফ্রি।

এভাবেই চলছে সব। কায়েম হয়েছে কবরের শান্তি। ক্ষমতার বুটের তলায় চেপটা হতে হতে আমাদের মেরুদণ্ড মাটির সাথে মিশে গেছে। সময়ের রক্তে বরফ জমেছে। নিষ্ঠুর উপহাসে নির্বাক এবং গ্লানির আবর্জনায় লাঞ্ছিত এক বাস্তবতাকে আমরা মেনে নিয়েছি। অনবরত অপমানের বিপরীতে প্রতিকারহীন স্তব্ধতাকে আমরা পরিধান করেছি। দস্যুতা, দুর্নীতি, একচেটিয়াবাজি আর বেপরোয়া দলনের কুৎসিত খেলা আমাদের প্রাণকে প্রাণের হানিতেও নিষ্প্রাণ করে ফেলেছে।

রাষ্ট্র হয়ে উঠেছে বিশেষের, সবকিছুর ওপর বিশেষ হয়ে আছে সবকিছু। রাষ্ট্র মানে দল, আরো বিশেষ অর্থে এলাকা ও পরিবার, আরো সুনির্দিষ্ট বিচারে ব্যক্তি। সমস্ত কিছুই এই চক্রে বিন্যস্ত। তারাই একচ্ছত্র, নিয়ন্ত্রক, শাসক ও সর্বেসর্বা। সবকিছুর মালিক-মুখতার। জনগণকে এই মালিকানায় নিজেদের স্বত্ব পরিহার করে খুশি থাকতে হবে। ধন্য ধন্য করতে হবে।

আমরা চেয়েছি জোরে নিশ্বাস নিতে। বিপরীতে লালচক্ষুর তীব্রতা নাভিশ্বাসকে করে দিয়েছে আমাদের নির্ধারিত নিশ্বাস। আমরা চেয়েছি বলতে যে আমরা আছি। কিন্তু বিপরীতে ক্ষমতার থাপ্পড় আমাদের বলাকে করেছে নিঃশব্দ। তারপর আমরা আছি বটে, কিন্তু নাই হয়ে আছি। নৈঃশব্দ্যে আছি। নিজেদের থাকার অর্থকে অস্বীকার করে আছি।

শিক্ষার্থীরা, তোমরা নৈঃশব্দ্য ভাঙলে। জঘন্য বিপদ জানার পরও তোমরা জাগরণকে সালাম জানালে। তোমাদের উচ্চারণে গভীর আবেগ আর ভালোবাসা। তোমাদের চোখেমুখে রক্তের চাঞ্চল্য। সত্যিকার ভালোবাসার সাথে তোমরা তারুণ্যের মিলন ঘটালে। এর মধ্যে উত্তেজনার চেয়ে বেশি সুস্থির দৃঢ়তা, প্রগল্ভতার চেয়ে বেশি আত্মবিশ্বাস। তোমাদের দাবি ও পরিকল্পনা, নির্দিষ্ট ও সুস্পষ্ট সুর তোমাদের আন্দোলনের বিষয়ের পাশাপাশি তোমাদের নিয়ে এসেছে আমাদের আগ্রহ ও প্রত্যাশার লাল বিন্দুতে। আজ বলতে পারছি, না, শেষ শিখাটি নিভে যায়নি। আমাদের নতুন জেনারেশন মেরুদণ্ড প্রদর্শন করতে জানে।

ঘাতকের গুলির সামনে অপরাজেয় সাহসের বুক পেতে দেওয়া আবু সাঈদদের জন্ম দেওয়া জারি রেখেছেন আমাদের মায়েরা। আবু সাঈদের সাহসী আত্মদান ঘাতকের চরিত্রকে আরেকবার সামনে এনেছে। দুই হাত দুই দিকে প্রসারিত করে দাঁড়ানো আবু সাঈদ কারো জন্য হুমকি তৈরি করেননি। পুলিশ ঠান্ডা মাথায় গুলি করে হত্যার মাধ্যমে জানাল, তোমাদের জীবন তুচ্ছ। ক্ষমতাবলয়ের ইচ্ছার বাইরে পদপাত করলেই নির্বিচার হত্যাই তোমাদের প্রাপ্য বিচার।

হ্যাঁ, জীবন এখানে তুচ্ছ বলেই গুলি ও সংঘর্ষে আজ মারা গেল ছয়জন। ঢাকা, চট্টগ্রাম ও রংপুরে। এই মৃত্যুর শিকার মানুষেরা গরিব, তাদের কেউ হকার, মোহাম্মদ শাহজাহান, কেউ পথচারী মো. ফারুক, কেউ শিক্ষার্থী সবুজ আলী, মো. মনির, ওয়াসিম আকরাম এবং ফিরোজ আহমদ। প্রত্যেকের পরিচয় হলো, তারা গরিব। এই গরিব মানুষগুলো সমস্ত শ্রেণি, পেশা ও সামাজিক বিন্যাসের সকল ভাঁজে সোনামি সৃষ্টি করবে। আবু সাঈদের মৃত্যু আসাদের মৃত্যুর প্রভাবকেও অতিক্রম করবে। কারণ, গণবিপ্লবের জ্বালানি

হবার আইকনিক সকল উপাদান আমার বিচারে এখানে একত্র হয়েছে। এই মৃত্যুগুলো মোটেও নীরবে কবরস্থ হবে না। গর্জন করবে, আমরা বুঝছি, সরকার বুঝছে না। হয়তো আমাদের এই বুঝ সরকারের চোখে অপরাধ।

মৃত্যুগুলোর পেছনের কারণগুলো হয়তো আলাদা। কিন্তু একটি সাধারণ কারণ আছে সবার মৃত্যুতে। তা হলো সঠিক সময়ে সমাধানের পথে না গিয়ে ক্ষমতাসীনদের দম্ভ, শক্তিবাজি ও নির্মমতা। যদিও তারা দায়ী করছে তৃতীয় পক্ষকে।

কিন্তু সাধারণ শিক্ষার্থী ও সরকার যদি হয় দুই পক্ষ, তাহলে দৃশ্যমান তৃতীয় পক্ষ এখানে কে? নিশ্চয় ছাত্রলীগ। বাদবাকি যে বিএনপি, জামায়াতের দিকে ইশারা করা হচ্ছে, তা ক্ষমতাসীনদের মুখস্থ চর্চা এবং ষড়যন্ত্রতত্ত্বের ধারাবাহিক ভাষণ। বিগত ষোলো বছর ধরে প্রতিদিন প্রতি রাত ক্ষমতাচক্রের জবানে বিএনপি-জামায়াতকে দায়ী করার যে অনবরত অনুশীলন প্রথায় পরিণত হয়েছে, এটা তারই ধারাবাহিকতা।

বিএনপি-জামায়াত কোনো নিষিদ্ধ রাজনৈতিক সংগঠন নয়। তারা দেশে চলমান রাজনৈতিক ইস্যুতে মতামত দেবে, অবস্থান নেবে, এমনকি সুবিধা নেবার চেষ্টা করবে, এটা রাজনৈতিক স্বাভাবিকতা। সারা দুনিয়ায় বিরোধী দলগুলো এমনটি করে।

কিন্তু এখানকার মিডিয়া সরকারি বয়ানকেই শেষ কথা হিসেবে রাষ্ট্র করতে চায়। তাদের উচিত প্রমাণ চাওয়া। বিরোধী দলের অংশগ্রহণ সমস্যা নয়, এটা তাদের অধিকার। কিন্তু তাদের অপরাধমূলক অংশগ্রহণ থাকলে এর প্রমাণ কী? সরকারের কুটিল খেলা অতীতে হয়তো কাজ করেছে, কিন্তু সব সময় করবে?

রাজনীতির এই কুটিল খেলা শিক্ষার্থীদের অপাপবিদ্ধ সাহস ও প্রত্যয়কে মলিন করতে পারেনি। তারা প্রমাণ করতে চাইছে রাষ্ট্রের মালিক কোনো ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা কায়েমি শ্রেণি নয়। রাষ্ট্র জনগণের। রাষ্ট্রের ওপর জনগণের সেই কর্তৃত্বকে প্রতিষ্ঠা করতে হবে। জবাবদিহিকে নিশ্চিত করতে হবে। বংশভিত্তিক রাজরক্তের হাতে লাঞ্ছনার সনদ নিয়ে আমরা জন্মিনি। তা থেকে মুক্ত হতে হবে। তাদের জমিদারি তালুক নয় এই রাষ্ট্র। শাসকদের হতে হবে জনতার সেবক। প্রশাসনের দায়িত্বরত ব্যক্তিবর্গ জনতার কর্মচারী।

দুর্বৃত্তায়িত ক্ষমতাচক্র পেশি ও প্রতারণার ওপর সওয়ার হয়ে আমাদের জীবনের ওপর গড়েছে উপনিবেশ। সেই উপনিবেশের বরকন্দাজ হয়ে আছেন প্রশাসন কর্তাদের অনেকেই। তারা জনতার প্রভু হতে চাইছেন। কিন্তু তাদের আপন জায়গা চিনে নিতে হবে। সেই অনুযায়ী চরিত্র ধারণ করতে হবে। দেশ

ও জনতার ওপর চাপিয়ে দেওয়া উপনিবেশ কোনো জনমতের ধার ধারে না। জনতার সমর্থনের ধার ধারে না। নির্বাচিত হবারও কোনো প্রয়োজন তার নেই। সংবিধান হচ্ছে তার স্বার্থশিকারের ইচ্ছাপত্র। সংসদকে তারা বানিয়েছে দলীয় ক্লাব। এই পরাধীন, পরাজিত ও পিষ্ট বাস্তবতাকে উন্নয়নের গল্প আর মুক্তিযুদ্ধের চেতনার নাম করে খাওয়াতে চাচ্ছে আমাদের। আমরা খাইনি। জনগণ খায়নি। জনগণ উন্নয়নের সেই গল্পকে ফাক করে দেবে, যা রচিত হচ্ছে তাদের প্রাণ, সম্মান ও অন্যান্য অধিকারের বিনিময়ে। জনগণ সেই দেবতাকে পায়ের তলে গুঁড়িয়ে দেবে, আমাদের কাছে যার বাধ্যতামূলক পূজা চেয়েছেন।

জনগণ অন্ধ নয়, যদিও আপনারা মনে করেন তাদের চোখ নেই। তারা সেই দৃশ্যও দেখছে, যা আপনারা লুকাবার সব রকমের চেষ্টা করেছেন। তাদের চোখে আপনারা কাপড়হীন রাজা। এখন বালকেরা বলবে–রাজা তোর কাপড় কই?

কথাগুলো বেশি হয়ে গেল না? না, ঘটনা সেদিকেই যাচ্ছে। এসব বিষয় আন্দোলনের মূল দাবিতে নেই। কিন্তু গুলি ও নির্মমতা দিয়ে আন্দোলনকে যে অর্থ ও গভীরতা দেওয়া হয়েছে, তাতে আন্দোলনটি এসব মর্মকে বহন তো করছেই, সাথে সাথে বহন করছে ওয়ান/ইলেভেনের পর থেকে এ অবধি চলা ক্ষমতাচক্রের গোটা অসুস্থতাকে বিদায় করার প্রসঙ্গও। অনির্বাচিত ক্ষমতার ন্যায্যতার জরুরি কিন্তু কম উচ্চারিত সওয়াল অচিরেই উঠবে। তখন কোটা আন্দোলনের তরুণ মিছিলগুলো এক দফার এমন লাভা উদ্‌গিরণ করবে, যার সাথে সরকারের পরিচয় ঘটেনি আগে। কারণ, স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, স্বৈরতন্ত্র এবার তার আসল প্রতিপক্ষের মুখোমুখি হয়েছে এবং সেই প্রতিপক্ষের নাম জনতা। ছাত্ররা জনতার সবচেয়ে অগ্রসর ও সচেতন অংশ। ইতিহাসের নিয়মেই তারা অমোঘ গন্তব্যের দিকে আমাদের আকাঙ্ক্ষাকে চালিত করছে।

সরকারের অবস্থান ইতিহাসের বিপরীতে। প্রাকৃতিক সত্যের বিপরীতে। এখন পরামর্শ দিলেও সে শুনবে না। কারণ, চাটুকারিতা ছাড়া আর কোনো কিছু শোনার মন ও কান থেকে সে বঞ্চিত। সময়ের দেয়ালিকায় যা লেখা আছে, তা আপন পরাক্রমে উচ্চারিত হবেই। তবু বলি, কোটা সংস্কার ইস্যুতে অচলাবস্থা ও সংকট থেকে যদি বেরিয়ে আসতে হয়, তাহলে সরকারকে একরৈখিক অবস্থান থেকে সরে আসতে হবে। কোটা ব্যবস্থার যৌক্তিক সংস্কার এবং সে জন্য আন্দোলনকারীদের দাবি মেনে নেওয়া ও ন্যায্য ছাড় দেবার মধ্যেই রয়েছে স্বাভাবিক সমাধান। ক্ষমা চান, লজ্জিত হোন। অপরাধ

স্বীকার করুন। এখনই তা না করলে পরে বসতে চাইলেও বোধ করি লাভ হবে না।

হত্যাকে সমাধান মনে করছেন, কিন্তু এটা সমস্যা। গণমতকে অবজ্ঞা করাকে শক্তি মনে করছেন, কিন্তু এটা দুর্বলতা। পুলিশ ও অন্যান্য বাহিনীর নির্মমতাকে নিরাপত্তা মনে করছেন। তাদের নির্মমতা জনগণকে দমাতে পারবে না। তাদের পাহারা আপনাদের বাঁচাতেও পারবে না। বরং ভাবুন, এই পাহারা সরে গেলে কোথায় পালাবেন?

বস্তুত সরকার ভুল অঙ্ক কষছে। ক্ষমতাকে দম্ভ দিয়ে নিরাপদ করতে চাইছে। কিন্তু পাপ বোধ হয় চূড়ান্ত পরিণতির শেষ মঞ্চে। নিয়তির সাইরেন বোধ হয় বেজে গেছে। এই আন্দোলনকে সেই পরিণতির উপলক্ষ বানানোর জন্য যত ধরনের বোকামি করা লাগে, সরকার তা করবে। এতে হয়তো অজস্র প্রাণ আমরা হারাব। কিন্তু প্রাণ দিতে দিতে প্রাণের মূল্য প্রতিষ্ঠার লড়াই থেকে মানুষ কখনো পিছু হটে না। এ জন্যই সে অনন্য, অপরাজেয়।

এই আন্দোলন ছোট স্ফুলিঙ্গ থেকে বড় দাবানলের দিকে যাচ্ছে। ভয় নেই। মাভৈ। সবার এগিয়ে আসা দরকার। সব পেশার, সব অঞ্চলের, সব চিন্তার, সব ধারার, সব ধর্মের, বিশেষত তাওহিদবাদীদের।

ইনসাফ টুয়েন্টিফোর.কম : ১৮ জুলাই, ২০২৪

ইসলামি তত্ত্বে রাজনৈতিক আজাদি : লড়ো উপসংহারের জন্য

একটু রাষ্ট্রবিজ্ঞানে দৃষ্টি দিই; ইসলামি রাষ্ট্রবিজ্ঞানে। দর্শনের মতো রাষ্ট্রবিজ্ঞানও মানুষের স্বরূপ জানতে চায়। যদিও এই প্রক্রিয়া মেটাফিজিকসের কাছে সমর্পিত নয়।

এক.

ইসলামি রাষ্ট্রতত্ত্বে রাষ্ট্রগঠনের মূলে আছে ফরদ (ব্যক্তি)। ব্যক্তির বিকাশ নির্ভরশীল মুজতামার (সংঘবদ্ধতা) ওপর। মুজতামা নির্ভরশীল তায়াবুনের (পারস্পরিক সহায়তা) ওপর।

তায়াবুন কিসের ওপর নির্ভরশীল? সে নির্ভরশীল উলফতের (সম্প্রীতি, দয়া, ভালোবাসা ও সহানুভূতি) ওপর। এই উলফত প্রকাশিত হয় পারস্পরিক সহবোধ ও সহযোগিতার ভিত্তিতে।

এই সহযোগিতার পথ ধরে মানুষ তৈরি করে মাজমা; ঐক্যের পাটাতন। প্রথম যে মাজমা মানুষের দ্বারা তৈরি হয়, তার নাম আয়িলায়ে মুজতামা বা মিলিত পরিবার। এরপর মুজতামাউস সুগরা বা সমাজ, গ্রাম, গোষ্ঠী, শহর, নগর ও নাগরিক প্রতিষ্ঠান। এরপর তৈরি করে মুজতামাউল উসতা বা মধ্য আকারী ঐক্যপ্রতিষ্ঠান। যার মধ্যে আছে গ্রাম, শহর ও নগর, নগরসমূহের যৌথতা এবং রাষ্ট্র। তারপর তৈরি হয় মুজতামাউল কুবরা বা জাতি, গোষ্ঠী ও রাষ্ট্রসমূহের সমন্বিত বিশ্বরাষ্ট্র বা বড় সমাজ।

ইসলামি রাষ্ট্রদর্শন সমাজ, গোষ্ঠী ও নগরকেই সর্বশেষ রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান মনে করে না। মানুষের যে ঐক্য সমাজ অবধি এসে থেমে গেছে, তাকে ইসলামি রাষ্ট্রবিজ্ঞানে বলা হয় গাইরে কামিল মুজতামা বা অপূর্ণ সম্মিলন।

যখন তা আরো বড় পরিসরে ক্রিয়াশীল হয়ে রাষ্ট্র গঠন করবে, তাকে বলে কামিল মুজতামা বা পূর্ণ সমবায়। কিন্তু তাও দুই রকমের। যে মুজতামা নিছক রাষ্ট্র গঠন করেই থেমে গেছে, সে হচ্ছে মুজতামাউল মাহদুদাহ বা সীমায় আবদ্ধ ঐক্য। আর যে সম্মিলন বহু রাষ্ট্র, গোষ্ঠী ও জনসমষ্টিকে একত্র করে বৈশ্বিক ঐক্য নিশ্চিত করবে, তাকে বলে মুজতামাউশ শামিলাহ বা ব্যাপকভিত্তিক ও সর্বধারী ঐক্য।

আধুনিক জাতিরাষ্ট্রের পটভূমিতে অপূর্ণ মুজতামাউল মাহদুদাহ (সীমাবদ্ধ ঐক্য) নিয়েই রাষ্ট্রসমূহ বর্তমান। কিন্তু এই সীমাবদ্ধ ঐক্য কামিল (পূর্ণ) সম্মিলনের আওতায় আসবে, না তাকে নাকিস (অপূর্ণ) বলা হবে, সেটা তর্কের বিষয় হিসেবে রয়ে গেছে।

দুই

এই যে সীমাবদ্ধ মুজতামা; রাষ্ট্র, তাও মানুষের জন্য বিরাট অনুগ্রহ এবং মানুষের গ্রেট অর্জন। এটা মানুষকে গড়তেই হয়। না গড়ে তার নিস্তার নেই।

কিন্তু তা গঠিত হয়ে গেলে তার চরিত্র কেমন হয়?

এ প্রশ্নের আগের প্রশ্ন হলো রাষ্ট্রের চরিত্র নির্ধারিত হবে কী দিয়ে?

তা নির্ধারিত হবে প্রধানত দুই ধারার উপাদান দিয়ে।

এক. শাসক ও শাসনকর্মে যুক্ত শ্রেণির চরিত্র।

দুই. জনগণের পারস্পরিক সহবোধ ও সহযোগিতার মাত্রা ও ধরন।

যদি উভয় ধারা পরস্পরের সহযোগী হয়, কল্যাণমুখী হয়, তাহলে রাষ্ট্রকে বলা যাবে মুজতামাউল ফাদিলাহ বা কল্যাণী সমবায়, কল্যাণরাষ্ট্র।

কিন্তু রাষ্ট্র কল্যাণী কি না, নির্ধারিত হবে কী দিয়ে? সেটা নির্ধারণের উপাদান অনেক। কেন্দ্রীয় উপাদান হলো আদর্শ কী হবে, তার পরের উপাদান হলো মানুষের আফজালিয়্যত তথা শ্রেষ্ঠত্ব, সম্মান ও মহিমা। জাহেলি ক্ষমতা আদর্শ ও মানবমর্যাদাকে সংকুচিত করে, অবজ্ঞা করে, অস্বীকার করে।

এর পরে গুরুতর, এমন তিনটি উপাদানের কথা আজ বলি।

এক. আদল ও এহসান (ন্যায় ও সত্যনিষ্ঠা) : ওমর (রা.) বলেছেন, রাষ্ট্রের ভিত্তি হলো আদালত। ফখরুদ্দীন রাজী (রহ.) ইসলামি রাষ্ট্রের সমস্ত বিষয়কে একটামাত্র শব্দ দিয়ে ব্যক্ত করা যায় কি না,

> সে প্রশ্ন তুলেছেন। তার মতে, সেই শব্দ হলো আদল, ন্যায়প্রতিষ্ঠা। আদলের বিপরীত হচ্ছে জুলুম, বিচারহীনতা কিংবা সিলেকটিভ জাস্টিজ। এর ফলাফল হচ্ছে ক্ষমতাহীনের আর্তনাদ ও ক্ষমতাসীনের জবরদস্তি।

ন্যায়ের সাথে সত্যের সম্পর্ক। সত্যের সাথে ভারসাম্যের সম্পর্ক। সত্যহীনতা ছড়িয়ে পড়ে নিষ্ঠাহীনতার কারণে। মিথ্যার ওপর বা মিথ্যার মিশ্রণে পরিচালিত শাসন ভারসাম্যকে বিনাশ করে। সমাজের সকল স্তরে যখন প্রত্যেকের আপন আপন ক্ষেত্রে ভারসাম্য নিশ্চিত হবে, তখন বলা যাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এহসান। এহসানের বিপরীত হচ্ছে বৈষম্য, বৈষম্যের ফলাফল হচ্ছে নৈরাজ্য।

দুই. আমন ও রিয়ায়াহ (নিরাপত্তা ও জনকল্যাণ)

আমন বা নিরাপত্তা প্রথমত রাষ্ট্রের জন্য জরুরি, নাগরিক সত্তার জন্যও জরুরি। নিরাপত্তা রাষ্ট্রে বসবাসকারী প্রতিটি প্রাণের অধিকার। মানুষ, গাছপালা, পশুপাখি–সবার। নিরাপত্তার নিশ্চয়তা রাষ্ট্রকে দিতে হবে এবং তা নফস (জীবন), দ্বীন (ধর্মবিশ্বাস), মাল (সম্পদ) আকল (মেধা), নসল (সন্তানসন্ততি) ইত্যাদির। রাষ্ট্রের নীতি ও ব্যবস্থাপনা হবে জনকল্যাণে নিবেদিত। এর অনুপস্থিতি নাগরিকদের এই প্রতিষ্ঠানকে একটি শ্রেণি বা কতিপয়ের প্রতিষ্ঠানে পরিণত করবে, যা রাষ্ট্রকে কল্যাণী বানাবে না, বিপরীত দিতে হাঁকাবে।

তিন. তাতাউউর (উন্নয়ন)

ইসলামি রাষ্ট্রতত্ত্বে উন্নয়ন হবে দুই খাতে এবং সমান মাত্রায়। এক খাত জাগতিক, আরেক খাত আধ্যাত্মিক। কেবল চলাচল, খাবারদাবার, যানবাহন, পেশা, বেঁচে থাকার নিরাপত্তা, অর্থনৈতিক সুবিধা নিয়েই মানুষের জীবন চলে না। যদি তার নৈতিক-আধ্যাত্মিক উন্নয়ন না হয়, তাহলে মানুষ হিসেবে বিপদের মধ্যে সে আছে এবং নিজের সত্তা থেকে সে বিচ্ছিন্ন হতে থাকবে, বঞ্চিত হতে থাকবে।

ফলে পার্থিব ও অপার্থিব উন্নয়নকে গুরুত্ব দিতে হবে সমান মাত্রায়। উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রায়ও থাকতে হবে সমন্বয়। উন্নয়নের সাথে যুক্ত

প্রতিষ্ঠানসমূহেও থাকতে হবে সমন্বয়। নৈতিক, চারিত্রিক, আধ্যাত্মিক উন্নয়নের দাবি হলো প্রতিটি উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে থাকবে প্রবল ও যথার্থ জবাবদিহি। এর অনুপস্থিতি মানেই রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানসমূহে স্বেচ্ছাচার, দুর্নীতি ও লুটের মচ্ছব। আর জনস্তরে সাংস্কৃতিক ও নৈতিক অবক্ষয়।

তিন.

সরকার যদি মুজতামাউল ফাদিলাহের চরিত্র ধ্বংস করে, তাহলে সে কী হতে পারে? তাহলে সে হবে মুজতামাউত তাখাল্লুফিয়্যাহ বা অধঃপতনমুখী সমবায়-সরকার। আল ফারাবির মতে, সে হবে হুকুমাতুল জাহিলিয়্যাহ (মূর্খতার ক্ষমতাব্যবস্থা।)

তার হাতে থাকবে অনেক সুবিধা। কিন্তু দায়বদ্ধতা থাকবে না। সে করবে অনেক কাজ। কিন্তু জবাবদিহি থাকবে না। সে মনোযোগী হবে মুখ্যত দৃশ্যমান উন্নয়নে। কিন্তু উন্নয়নের শস্যের চেয়ে বেশি জন্ম নেবে দুর্নীতির আগাছা। সে ক্ষমতাকে মনে করবে কুক্ষিগত অধিকার। তার ক্ষমতার গোপন চাবিকাঠি হবে শক্তি; শক্তির নিয়ন্ত্রণ নয়, প্রদর্শন, প্রয়োগ। সে ভয় ধরিয়ে দিয়ে জয় করতে চাইবে।

তার ভয় দেখানো কাজ করবে না, তা নয়। তা কাজ করবে। অনেক সময় ধরে কাজ করবে। এই সুযোগে সে হবে আরো চরিত্রহীন, তার চারপাশে থাকবে সুবিধাভোগী শ্রেণির ভিড়। তারা ক্রমেই তৈরি করবে বহুমুখী সুবিধার চক্র। চারদিকে স্তাবকতা, চারদিকে জয়জয়কার, চারদিকে একচ্ছত্রতা। বিপরীত চিত্রগুলোকে অদৃশ্য করা হবে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রতিক্রিয়াসমূহকে সে সবলে প্রত্যাখ্যান করবে। ভাববে, জয়ই তার নিয়তি। ভাববে সমাজের প্রতিক্রিয়া দমনের সব কৌশল তার জানা।

এই আত্মবিশ্বাস যখন আত্মবিকারের জায়গায় পৌঁছে যাবে, তখন হুমকি হবে তার ভাষা, ধমক ও দম্ভ দিয়েই সে কথা বলবে। সে ভাববে সবকিছু ঠিক আছে। সবকিছুই তার পক্ষে। বিপরীতে যা আছে, তা নিছক পোকামাকড়।

তখনই ঘটবে বড় এক ঘটনা। ক্ষমতাচক্রের মোলাকাত ঘটবে আসল শত্রুর সাথে। তার আসল শত্রু হলো জনগণ।

চার.

কিন্তু জনগণ এই বিপুল অনড় ক্ষমতাবলয়ের সাথে কী দিয়ে লড়বে? তাদের কী আছে? মাওয়ার্দি দেখান, জনগণ এ পরিস্থিতিতে সংগঠিত করবে নিজেদের আসল সামর্থ্যকে। সেই সামর্থ্য হলো মুজতামা (সংঘবদ্ধতা) ও তায়াবুন (পারস্পরিক সহযোগিতা)।

ইবনে খালদুনও বলেছেন একই সুরে। তার মতে, জনগণ তখন নিজেদের আসাবাহকে (জনবন্ধন) শক্তিশালী করবে। তা করবে মাওয়াদ্দাহর (ভালোবাসা, সহবোধ, সম্প্রীতি) ভিত্তিতে, তাহাদ্দিসমূহের (চ্যালেঞ্জ) বিরুদ্ধে। ইবনে খালদুনের বিচারে চ্যালেঞ্জসমূহ তখন দুই রকম এবং কোনো রকমই উপেক্ষণীয় নয়। এক. দাখেলি (অভ্যন্তরীণ, দেশীয়, স্থানীয়)। দুই. খারেজি (বহিরাগত)।

এর বিপরীতে জনতার আসাবিয়্যত একদিনে সংগঠিত হবে না। তা সংগঠিত হবার শর্ত আছে। প্রথমত, চ্যালেঞ্জগুলো হতে হবে সর্বজনীন। মানে প্রত্যেকেই অনুভব করবে, এই চ্যালেঞ্জ ব্যক্তিগত আমি ও বৃহত্তর আমিকে বিপন্ন করবে।

দ্বিতীয়ত, চ্যালেঞ্জগুলোর ধারক ও বাহক শক্তি হবে সুনির্দিষ্ট। কিন্তু তারা সুনির্দিষ্ট হলেও তাদের কর্মকৌশল যদি অচিহ্নিত থেকে যায়, তাহলেও জনতার শক্তি প্রতারিত হবে। অতএব, তৃতীয়ত, তাদের কর্মকৌশল, প্রকারণ, শক্তির ধাপসমূহ এবং তার জীবনীসামর্থ্য থাকবে হবে পরিষ্কার।

চতুর্থত, জনতার লড়াই হবে অধিকতর অন্তর্ভুক্তিমূলক, দীর্ঘজীবিতার প্রবল সামর্থ্য, সামাজিক শক্তির ইতিবাচক সংযোগ।

তাকে অবশ্যই ক্ষমতাচক্রের সকল কৌশলের বিপরীতে গণকৌশলকে অগ্রগামী রাখতে হবে। সেটা নিশ্চিত হবে দুই ধরনের আকল প্রয়োগে। এক. আকলে ফেলি (ব্যবহারিক বুদ্ধিবৃত্তি)। যা বলে দেয় এখন কী করা উচিত। দুই. আকলে নাজারি (তাত্ত্বিক বুদ্ধিবৃত্তি), যা প্রতিটি পরিবর্তনশীল পরিপ্রেক্ষিতে কাজের অপূর্ণতা ও খুঁতকে মোকাবিলা করবে। কর্মধারার বিবর্তনিক মোমেন্টসমূহকে উচিত নির্দেশনা দেবে, বৈধতার বয়ান ও কাজের ন্যায্যতার মধ্য দিয়ে পূর্ণতা অবধি নিয়ে যাবে। এই ধারার সক্রিয়তা অনেক বেশি।

কায়েমি ক্ষমতা নিজেকে দাহিয়্যা (ভিকটিম) হিসেবে দাবি করবে এবং সর্বান্তঃকরণে চাইবে জনতার ওপর যেন ভায়োলেন্সের ইলজাম (অভিযোগ) আরোপ করা যায়, যাতে সবার ওপর সব ধরনের জুলুমকে ন্যায্যতা দেওয়ার পথ তৈরি হয়।

সামাজিক সংগ্রাম সাধারণত শুরু হয় এমন সব তাহাদ্দির (চ্যালেঞ্জ) কারণে, যা মুদরাকাত (অনুভবযোগ্য, খোলাখুলি লক্ষ্যযোগ্য)। কিন্তু এই সংগ্রামের পরিণতি নিশ্চিত হয় এমন সব তাহাদ্দির মোকাবিলা করতে পারা না পারার ফলে, যেগুলো তাজরিদাত (অলক্ষণীয়)। এর নমুনা হতে পারে বিভিন্ন দেশে চলমান গোয়েন্দা কর্মকাণ্ড, বহুস্তরী পলিসি এবং আঞ্চলিক ও বৃহত্তর শক্তিসমূহের কৌশলগত গোপন স্বার্থবিনিময়।

এই ধরনের আড়ালে থাকা উপাদানসমূহ আজকের দুনিয়ার অধিকাংশ গণপ্রতিরোধের কোরবানিকে ফলাফল অবধি যেতে দেয় না। এসবের সক্ষম মোকাবিলা করেই কেবল জনতার মুজতামাকে (সংঘবদ্ধতা) লক্ষ্য পূরণ করতে হবে।

পাঁচ.

ব্যাপারটা শেষ অবধি জনতার সংগ্রামের ঐক্য, কৌশল, নৈতিকতা, ন্যায্যতার সামাজিক স্বীকৃতি এবং গতিশীল ধারাবাহিকতার ওপর নির্ভর করে। এটা যদি যথাযথ থাকে, তাহলে সমাজের জীবন ও মোকাবিলা একই বিন্দুতে মিলিত হয়। সে মোকাবিলার মধ্যেই দেখে জীবনের মূল্য ও সম্মান, ইনসাফ ও নিরাপত্তা এবং মুক্তি ও কল্যাণের সম্ভাবনা। একে যদি গণ-আকাঙ্ক্ষার সত্য হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা যায়, তাহলে জনতার লড়াইয়ের সামনে থাকে বিজয়।

এই যে দৃষ্টিভঙ্গির কথা বললাম, যা ইসলামি রাষ্ট্রবিজ্ঞানের তত্ত্ব। কিন্তু এ তত্ত্ব আজকের দুনিয়ায় অধিকতর জীবন্ত, বাস্তব। বিগত কয়েক দশকে বিশ্বের দেশে দেশে যেসব গণ-আন্দোলন-গণবিক্ষোভ হয়েছে, সেগুলো প্রমাণ করেছে কোনো জনগোষ্ঠীর মাত্র ৩ দশমিক ৫ শতাংশ মানুষ যদি প্রত্যক্ষ, যথাযথ ও নিয়মিত প্রতিবাদে অংশ নেয়, তাহলে সেখানে জনতারই বিজয় হয়। হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপক এরিকা চেনোওয়েথের গবেষণা এই দাবি উত্থাপন করেছে।

(আমি মনে করি, সব জায়গায় এই সংখ্যা সব সময় কাজ না-ও করতে পারে। কখনো কখনো পরিস্থিতি হয়তো সংখ্যাটিকে আরো বড় পরিসরে দেখতে চাইবে।)

১৯৮০-র দশকে কমিউনিস্ট শাসনামলের পোল্যান্ডে হয়েছিল সলিডারিটি আন্দোলন, দক্ষিণ আফ্রিকায় বর্ণবাদবিরোধী আন্দোলন, নিকারাগুয়ার সোমোজা পরিবারের পতন, চিলির স্বৈরশাসক অগাস্তো পিনোশের পতন, সার্বিয়ার প্রেসিডেন্ট স্লোবোদান মিলোসেভিচের ক্ষমতাচ্যুতি, তিউনিশিয়ায়